## প্রথম অধ্যায়

# সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্যকৃতির পরিচয়

সুগভীর জীবনবোধ আশ্রয়ী উপন্যাস ও ছোটগল্পে প্রখর মুন্সীয়ানার সাক্ষর রেখেছেন বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতমা জনপ্রিয় রচয়েত্রী সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০-২০১৫)। বিংশ শতকের শেষ দশকে সাহিত্য সৃজনীকার রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ। বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে সাম্প্রতিককালের বৈচিত্র্যময় কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্যা। আমৃত্যুকাল ব্যাপী দীর্ঘ সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি বহু সুপাঠ্য উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা কথাসাহিত্য সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছেন। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলেও এক দীর্ঘ প্রস্তুতি পর্বের মধ্য দিয়ে নিজেকে ক্রমান্বয়ে পরিশীলিত করে লেখনী জগতে পদার্পণ করেন। নিজ সংসার ও কর্মস্থলের যাবতীয় কর্মভার সুষ্ঠরূপে সম্পাদন করে তিনি সাহিত্যসৃজনে মননিবেশ করে আধুনিক সমাজের বাস্তব রূপচিত্র, মানব সম্পর্কের নানাবিধ বিনির্মাণ, অবক্ষয়ী মূল্যবোধহীন যুবসমাজ, সমাজে প্রতিফলিত যুগের বৈশিষ্ট্য ও তার ফলবাহী মানব সমাজ, তাদের চেতন স্তরের ভাবনাস্রোত, নাগরিক জীবনে উত্থিত নর-নারীর জীবনের দোলাচলতা, নারী জীবনের অকথিত ভাষাগুলোকে কথাসাহিত্যে বাঙ্ময় করে তুলেছেন।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য ১৯৫০ সালের ১০ই জানুয়ারি (বাংলা ২৫শে পৌষ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে) বিহারের ভাগলপুরে অবস্থিত তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিত্রালয় মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে স্থিত কাদাই পাড়ায়। পিতার নাম ধী শঙ্কর ভট্টাচার্য ও মাতা প্রীতিলতা ভট্টাচার্য। দক্ষিণ কলকাতার লেক মার্কেটের কাছে তাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ বাস করতেন। ধীশঙ্কর ভট্টাচার্য কলকাতার প্রসিদ্ধ মোহনবাগান ক্লাবের একজন বিখ্যাত খেলোয়ার ছিলেন। এমনকি টেনিস খেলাতেও সম পারদর্শী ছিলেন। ধীশঙ্কর ভট্টাচার্যের দাদা শ্রী করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য ও একজন প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়ার। একসময় কলকাতার মোহনবাগান ক্লাবের প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়ার। একসময় কলকাতার মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন ও ভারতের জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়কত্বও করেছেন। অবসরগ্রহণের পরবর্তীতে দীর্ঘদিন মোহনবাগান ক্লাবে ফুটবল সচিব রূপে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যরা মোট পাঁচ ভাই-বোন (দুই বোন ও তিন ভাই) ছিলেন। সুচিত্রা দেবীই ছিলেন জ্যেষ্ঠ কন্যা। তাঁর ছোট বোন হলেন সুমিত্রা ভট্টাচার্য এবং তিন ভাই, যথাক্রমে — দেবকুমার ভট্টাচার্য, আশীষ ভট্টাচার্য ও মিলন ভট্টাচার্য। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের এক জ্যাঠতুতো বোন বর্তমানে চিত্র শিল্পী রূপে বিখ্যাত। নাম দীপালি ভট্টাচার্য। দক্ষিণ কলকাতার লেক মার্কেটের নিকটবর্তী বাড়িতেই

সুচিত্রা ভট্টাচার্য তার শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী হিসেবে কলকাতার ইউনাইটেড মিশনারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন করেন। এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতার বিখ্যাত লেডি ব্র্যাবোর্ন মহাবিদ্যালয়ে রসায়ন বিষয়ে অনার্সে ভর্তি হন। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছেলেবেলা থেকেই তিনি নাচ ও অভিনয় চর্চায় মগ্ন রইতেন। 'দক্ষিণী'-তে ওড়িশি নাচ শিখতেন। এমনকি 'কাবুলিওয়ালা' ও 'হারানো সুর' সিনেমা দুটিতে শিশু শিল্পী হিসেবে অভিনয় করেছেন। নেতৃত্বদানের অসাধারণ ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল। তিনি বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধূলা, অভিনয়, নাম, নাটক, সাজসজ্জা ইত্যাদি সবকিছুতেই নেতৃত্ব দিতে ভালোবাসতেন। তাই তাঁর কাকারা তাঁকে 'পাকাশ্রী' বলে সম্বোধন করতেন। শৈশবে তিনি খুব শান্ত ও ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। ভাই-বোনেদের কাছে তিনি আদরের 'বুড়িদি' নামে পরিচিত। পাড়ার সমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি নানারকম উৎসব অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন এবং তারা একটি ক্লাবও তৈরী করেছিলেন। নাম ছিল 'অনামী সংঘ'। পাড়ার মাঠে অনামী সংঘের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানা ধরণের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। পাড়ার দুর্গোৎসবে মণ্ডপে গিয়ে পূজার ফল কাটা থেকে সাজানো — ইত্যাদি প্রায় সকল কাজেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এছাড়া সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা। রবীন্দ্রজয়ন্তী, জলসা, নাটক প্রভৃতি যে কোন অনুষ্ঠানে তিনি সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও অংশগ্রহণও করতেন। একবার রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তীতে 'ঋতুরঙ্গ' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে তাঁরা সকলের প্রশংশা আহরণ করেছিলেন। পাশাপাশি পড়ার প্রতি ছিল তার তীব্র আকর্ষণ। সেসময়ের রীতি অনুযায়ী তিনি অস্টমশ্রেণি থেকে শাড়ি পড়তেন।

ব্যক্তিগত জীবনে বেশ জেদি ও অকুতোভয় ছিলেন। লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে রসায়ন নিয়ে অনার্সে ভর্তি হওয়ার সময়ে তিনি পাড়ার এক যুবকের সঙ্গে প্রেমজ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। পারিবারিক দিক থেকে সম্মতি না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত মাত্র আঠারো বছর বয়সেই ভালোবাসার সঙ্গী প্রদীপ মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে পরিবারের অমতে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। উভয়ের পরিবার এই বিয়ে না মেনে নেওয়ায় শুরু হয় তাদের যুগল জীবনের কঠোর সংগ্রামের পর্ব। নিজ জীবনের এই কঠোর সংগ্রামের ছায়া পরবর্তীকালে মুখর হয়ে উঠেছে তার উপন্যাস ছোটগল্পধারায়। সুচিত্রা ভট্টাচার্য বিয়ের পর জীবনের অনেকটা পর্ব পর্যন্ত বহু দুঃখ কষ্টে সয়ে জীবনপাত করেছেন। তবে প্রতম থেকেই তাঁর এই জীবন যুদ্ধের সময়ে পাশে পেয়েছেন তাঁর স্বামী প্রদীপ মুখোপাধ্যায়কে। নিজে বেশ সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে হলেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কুদঘাটে প্রায় বস্তিসদৃশ পরিবেশে এবং পরবর্তীকালে প্রথম পর্বে ঢাকুরিয়ার এক ভাড়াবাড়িতে বেড়ার ঘরে দীর্ঘকাল বসবাস করেছেন। একটি মাতঘরেই রান্না, খাওয়া এবং শোয়া। রোজগার বলতে কেবলমাত্র দুটো টিউশান আর স্বামী প্রদীপ মুখোপাধ্যায়ের সামান্য এক চাকরি। যে বাড়িতে তাঁরা বসবাস করতেন, সেই

বাড়ির কর্তাও অনাহারের জ্বালায় কাঁচা আটাগুলে খেয়ে বমি করত। আগুনের জ্বালে রান্না করাটা ছিল তাদের কাছে দুর্মূল্য। বহুদিন তাঁরা একবেলা বা আটপেটা খেয়ে জীবনধারণ করেছেন। এই সময়ে তাঁকে যে কতটা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে দিনপাত করতে হয়েছিল তা অনুমান করাটাও দুরূহ। সন্তান সম্ভবা সুচিত্রাদেবীর নিত্যদিনের আহার ছিল যৎসামান্য তেঁতুল গোলা জল আর ঠাণ্ডা ভাত। এভাবে চরম কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে তিনি পথ চলেছেন তুবও জীবন সংগ্রামে কখনও হেরে যাননি। সংসারে কিছু বাড়তি অর্থালাভের আশায় তিনি কলেজে পড়ার সময় থেকেই টিউশানি করতেন এবং ছোটধরণের একটি বেসরকারী সংস্থায় চাকরীও করতেন। দ্বিতীয়বর্ষে পড়বার সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সন্তানের জন্মের পর তার পিত্রালয়ের সঙ্গে আবার সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। তারা সুচিত্রাদেবীকে মেনে নেন। পরবর্তীতে মায়ের কাছে সন্তানকে রেখে তিনি কলেজে বা চাকরি করতে যেতেন।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত কার্যভার এবং সংসারের চাপে পরে তার রসায়ন অনার্স পড়বার স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। এরপর কলকাতার যোগমায়াদেবী কলেজে বাংলা বিষয়ে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন ও স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। সংসারের প্রয়োজনে তিনি বহুস্থানে চাকরি করেছেন। সবার প্রথমে তিনি একজন টাইপিস্ট কাম টেলিফোন অপারেটর পদে বিনি কোম্পানীর একটি এজেন্টের অফিসে যোগ দেন। এরপর একটি হোটেলে রিসেপসনিস্ট কাম টেলিফোন অপারেটর রূপে বেশ কিছুদিন চাকরি করেন। বাংলা বিষয়ে স্নাতক হওয়ার পর সরকারী চাকরি পাওয়ার লক্ষে বহু জায়গায় বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা দেন। সফল হয়ে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে কারণিক পদে কর্মে যোগদান করেন। এই চাকরী করবার সময়েই তিনি ডব্লু. বি. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৯ সালে কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি ডিমার্টমেন্টে গেজেটেড অফিসার রূপে সুচিত্রা ভট্টাচার্য যোগদান করেন। এই চাকুরি সূত্র ধরেই দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অফিসে কর্মরতা ছিলেন। শৈশব থেকেই যে সৎ ও নির্ভিকতা ছিল তার সহচর, চাকরী জীবনেও তিনি একজন সৎ ন্যায়বান কাজের প্রতি একনিষ্ঠ আধিকারিক রূপেই ক্যাত ছিলেন। তাঁর চাকরী জীবনে অসৎ পথে বিপুল অর্থাপার্জনের প্রচুর সুযোগ ও প্রলোভন এলেও তিনি কখনই নিজের নৈতিকতারবোধ থেকে ভ্রষ্ট হননি। তবে নৈতিকতার আদর্শে লালিত সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর সততা রক্ষা করতে গিয়ে বহুবার বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তবু বরাবর তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বাকীদের অনুজ্জ্বল করেছে। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া তাঁর শেষ সাক্ষাকার-এ তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে যাপিত সংসার জীবনের সংগ্রাম মুখর দিনগুলির কথা, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের কথা অকপটে বলেছেন — ‘‘... আলাপ তো ছোট্টবেলা থেকে। ও তো আমার পাড়ারই ছেলে। সামনাসামনি দেখাশোনা, চেনাশোনা, দু-বাড়িতে যাতায়াত — সেখান থেকেই আস্তে আস্তে প্রেম গড়ে

ওঠে। প্রেমটা আরো গভীর হয় আরকি। তবে আমরা বিয়ে করেছি খুব কম বয়সে। তাও একটা ঝড় ঝাপটার মধ্য দিয়ে। ও তো আমার পাড়ারই ছেলে। দু-বাড়ি থেকেই প্রবল আপত্তি। আমরা বেড়িয়ে এসে বিয়ে করি। প্র্যাকটিক্যালি তখন আমরা কাজকর্ম সেভাবে করি না। মানে টিউশানি করে চলে সংসারে — এই রকম একটা অবস্থা। প্রথম খুব ছোট চাকরী করতাম। আস্তে আস্তে অনেক ছোট ছোট কোম্পানিতে চাকরি করেছি। তারপরে আধা সরকারী চাকরি করেছি এবং খুব কম বয়েসে বিয়ে করেছি বলে আমাদের সংসারটাকে দাঁড় করানের তাগিদটা দু'জনেরই ছিল। এবং স্বাভাবিকভাবে সে কারণেরই আমাদের দু'জনের মধ্যেই একটা কমরেডশিপ গড়ে উঠেছে। যেটা ঠিক তথাকথিত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বলা যায় না। এটা বন্ধুর সম্পর্ক। এ আমার জীবনে পেছনে সবসময় একটা প্রেরণা হিসেবে কাজ করে গেছে। মানে ভয়ঙ্কর ভাবে যেটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়, মেয়েদের জীবনে যেটা মেয়েরা পায় না, আমাদের জীবনে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। আমার বর কিন্তু আমাকে সমসময় Inspire করেছে। পরীক্ষা দাও, আরো ভালো কিছু করো। ... আমি যখন লিখি তখন আমাকে চা করে দিয়ে আসাটাও ওদের কাজ।"[১]

চাকরীরতা কালীন সাহিত্য রচনার জগতে তিনি পূর্ণ মাত্রায় পদার্পণ করেন। একসময় কেবলমাত্র সাহিত্যে মনোনিবেশ করবার জন্য তিনি চাকরী থেকে 'স্বেচ্ছাবসর' নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সে সময়কার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে চাকরি না না ছাড়বার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি চাকরি ছাড়ার জন্য তৎকালীন শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের সচিব শ্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য মহাশয়ের শরণাপন্ন হন এবং তারই পরামর্শে তিনি ২০০৪ সালে মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে সরকারি চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে খুব স্বতস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত ছিলেন। সমাজের যা কিছু অন্যায় অবিচার দেখা মাত্রই তার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরেছেন একের পর এক সমাজের তৈরী করা অসঙ্গতি, মেয়েদের জন্য লৌহশৃঙ্খল স্বরূপ বিধিনিষেধের বেড়াজাল। কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন নি। জীবনের নানা পর্বে আমরা তাঁকে দেখেছি স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল ভাবে যে কোন বিরূপ ঘটনার সমালোচনায় মুখর হতে। কোনও কিছুর সামনে তিনি কখনও মাথা নত করেন নি। এটাই ছিল তাঁর জীবনে এগিয়ে চলার মূলমন্ত্র। তাঁর এই ইতিবাচক দৃঢ় অথচ সাবলীল ঋজু ভঙ্গী-র পরিচয় পরিলক্ষিত হয় উপন্যাস ছোটগল্পের ভূবনে। সার্থক সৃজনীকার রূপে তিনি সমাজের নানা বৈষম্য, ত্রুটি, অপশাসন ব্যবস্থা, নারীদের ওপর অন্যায় নিপীড়নের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন তাঁর সহজ লেখনী ধারায়। স্বীয় জীবনে আহরিত এবং সঞ্চিত অভিজ্ঞতার জলি তিনি উজার করে ছড়িয়ে দিয়েছেন তার অসাধারণ লেখনী ধারায়। আমাদের চারপাশের জগৎ থেকে অভিজ্ঞ দৃষ্টিঙ্গীতে আহরিত জীবন ভাবনা বোধকে নিজ কল্পনার রসে জারিত করে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শনের মাধ্যমে সাহিত্যের ক্যানভাসে কালি কলমের নিপুন আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনবোধ আশ্রয়ী এই

ভাবনাগুলো যখন লেখক ও পাঠক উভয়ের হৃদয়কেই সিঞ্চিত, মেদুর করে, এক অদ্ভুত তৃপ্তিবোধে সম্পৃক্ত করে তোলে, সেই মুহূর্তে লেখক ও পাঠক সত্ত্বা মিলেমিশে একাকার হয়ে শুধু সাহিত্য রসাস্বাদনে অবগাহন করে। এই সুখানুভূতির সঙ্গে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের পাঠক কুল বারবার পরিচায়িত হয়েছেন। তাই তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসগুলির চরিত্র এতো জীবন্ত, প্লট যেন আমাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে আহরিত, ঘটনা পরিবেশনের নিত্য-নতুন রীতি আমাদের চমকিত করে। সুখপাঠ্য এই রচনাগুলি তাই আজ এতো জনপ্রিয় দেশকালের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যা সার্বজনীনতা লাভ করেছে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য কেবল সুলেখিকাই নন, একাধারে তিনি সুমাতা, সুগৃহিনী এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলা একজন নাগরিক। যিনি সর্বদা অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক বলয়হীন ভাবে নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশে বরাবর তিনি সাবলীল। তিনি বেশ রন্ধন পটিয়সী ছিলেন। জি বাংলা চ্যানেল পরিচালিত 'রান্নাঘর' নামক অনুষ্ঠানে তাঁর সুপাক জনিত রন্ধনের জন্য দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিলেন। কিশোর মনন ঋদ্ধ বিখ্যাত 'মিতিন মাসি' নামক গোয়েন্দা চরিত্রটি আসলে তাঁর অন্তস্থল জাত ভাবনার বিচ্ছুরণ। পাঠকমাত্রেই জানেন যে 'মিতিন মাসি' একাধারে বিভিন্ন রহস্য উদ্‌ঘাটনে যেমন সিদ্ধহস্ত, ঠিক তার সমান্তরালে স্বামী ও সন্তানের জন্য বিভিন্ন উপাদেয় সুখাদ্য রন্ধনে পটিয়সী। 'মিতিন মাসি'-র মধ্য দিয়ে তিনি নিজস্ব রান্নার অসাধারণ নৈপুণ্যতার ডালি তুলে ধরেছেন। তাঁর বাড়ি ঘর সবসময় সাজানো গোছানো একেবারে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। রন্ধন শিল্পের পাশাপাশি ঘর সাজাতেও ভীষণ ভালোবাসতেন। খাদ্যরসিক সুচিত্রদেবীর পছন্দের তালিকায় প্রথাগত বাঙালি খাবারের সঙ্গে নিত্য নতুন চটপটে মুখরোচক ভাজাভুজিও দেদার পরিমানে ছিলো। লুচি মাংস বা লুচি সাদা আলুর চচ্চরি যেমন ভালোবাসতেন তেমনি বিভিন্ন তেলেভাজা ফুলুরি, চপ, কাটলেট, ফুচকা ও ততটাই প্রিয় ছিল। সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য আদ্যন্তে ছিলেন একজন নিভের্জাল খাঁটি মানুষ। খ্যাতির মধ্য গগনে জ্বাজল্যমান সূর্যের ন্যায় বিকশিত হলেও স্বভাবে একেবারে মাটির মানুষ। প্রাণচঞ্চলতায় পরিপূর্ণ সকলের সঙ্গে অকপট ভাবে মিশতে পছন্দ করতেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খেতেন। মেয়েলী আড্ডায় একরাশ প্রাণখোলা বাতাস এনে দিতো তাঁর সহাস্য বাচনভঙ্গী। খোলা মনের অধিকারীণী হওয়ায় যে কোন বয়সী মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতার তাকে একান্ত আপন করে নিতেন। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে যারা এসেছেন, তাদের একান্ত অনুভূতি যে অত্যন্ত সুখদায়ী, তা বলবার প্রয়োজন হয় না। নিজে যেমন সদা হাস্যময়ী, ঠিক তেমনি ভাবে যে কোন আবহকে তাঁর কথার জাদুতে মুহূর্তে হাস্যমুখর করে তুলতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ফলে যে কোন আড্ডার তিনিই ছিলেন মধ্যমণি। সকলকে আপন করে নেওয়ার এক ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারীনী ছিলেন সুচিত্রা দেবী। ভুবন ভোলানো হাসি মুখে পার করেছেন

বহু দুর্গম যাত্রাপথ। বহু শ্রমসাধ্য কর্মের পর ধীরে ধীরে একটু একটু করে সফলতার মুখ দেখেছেন। কিন্তু কখনই সংগ্রামের পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন নি। তাঁর অদম্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষদেশে পদার্পনের স্বাক্ষরবাহী।

সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য যে শুধু তাঁর সমবয়সীদের সঙ্গে মিশতেন তা নয়, তাঁর কন্যা মণিকুন্তলা কেশনের স্কুল, কলেজের বন্ধুদের সঙ্গেও তুমুল আড্ডা দিতেন। এ বিষয়ে তাঁর কন্যা মণিকুন্তলা 'দক্ষিণের সাঁকো' পত্রিকার 'শুভেচ্ছা বার্তা'-য় মায়ের পরিচিত মহলের সঙ্গে সখ্যতা এবং পরবর্তীতে উপন্যাস ছোটগল্পে তাদের অভাবনীয় উপস্থিতির কথা সুন্দর ভাবে উত্থাপন করেছেন — ''... এই সুযোগে আমার মা অর্থাৎ সুচিত্রা ভট্টাচার্য সম্পর্কে দু-চারটে ব্যক্তিগত কথা বলার লোভও সামলাতে পারছি না। প্রথমেই বলা ভালো, সুচিত্রা ভট্টাচার্য সম্পর্কে পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। শুধু তার মেয়ে বলে নয়, যে মানুষই তার কাছাকাছি গেছে, মোটামুটি নিকট বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তার পক্ষেই এক ধরণের সাবজেকটিভনেস চলে আসবেই। যেটা শুধু তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সিঞ্চিত। এটাই ছিল তার চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো ম্যাজিক। আমার এখনও চোখের সামনে ভাসে আমার স্কুলের বন্ধুরা কিভাবে দলবেঁধে এসে আমার বাড়িতে আড্ডা জমাত, আর কি নিখুঁত ভাবে তাদের সঙ্গে মিশে যেত মা। এমনটাই হয়েছিল, আমি বাড়িতে থাকি বা না থাকি, আমার বন্ধুদের কাছে আমাদের বাড়ি ছিল অবারিত দ্বার, তারা মায়ের সঙ্গে গল্প করেই দিব্যি কাটিয়ে দিত ঘন্টার পর ঘন্টা। বেশ কয়েকবছর পরে দেখেছি, আমার ওই বন্ধুরাই একটু কল্পনার রং মেখে, মায়ের গল্প, উপন্যাসের নানা চরিত্র হয়ে উঠল। শুধু তারাই নয়, আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠীরাও ছাড় পায়নি, তারাও কী নিখুঁত ভাবে ঢুকে পড়ল মায়ের লেখার দুনিয়ায়। কী অসামান্য দক্ষতায় যে মা তাদের চিত্রিত করেছিল 'কাচের দেওয়াল' উপন্যাসে। কিংবা আরও অজস্র লেখার খাঁজে খাঁজে। এই যে তরুণ সমাজকে গভীরভাবে চিনতে পারা, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে তাদের বিপন্নতা-অভিমান-হৃদয় দৌর্বল্য সব ফুটে উঠত তার ম্যাজিক কলমে। এবং এটাই ছিল তার ইউ এস পি। সম্ভবত এই কারণে এখনকার তরুণ কুলের কাছেও তার রচনাশৈলীর আবেদন হারায়নি।''[২]

মণিকুন্তলার চেয়েও তাঁর কাছে নাতি ও নাতনি ছিল সবচেয়ে প্রিয়। দুই প্রজন্মের এই চিরন্তন ভালোবাসাকে সিঞ্চিত করে রেখেছিলেন মুঠোফোনে। মোবাইলের রিংটোনে নাতি নাতনিদের কণ্ঠস্বর একসময় সকলকে মুগ্ধ করতো। দূর্গাপূজার সময় পরিবারের সকলকে সঙ্গে নিয়ে হইহই করে ঠাকুর দর্শনে বেড়িয়ে পরতেন। সদর্থক চিন্তাধারার অধিকারীনী ছিলেন বলেই জীবন যন্ত্রণারর জটিল স্তরগুলোকে হাসিমুখে পার করেছিলেন। আর একটা কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য, পাশে পেয়েছিলেন তাঁর যোগ্য সহচর প্রদীপ মুখোপাধ্যায় বাবুকে। যিনি সর্বদা ছায়ার মতো সঙ্গদান করেছিলেন তাঁর জীবন সঙ্গীনীকে। তথাকথিত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নয়, বরং বন্ধুভাবাপন্ন ভালোবাসায়

সিক্ত করেছিলেন উভয়ে উভয়ের জীবনকে। তাই প্রথাগত ভাবনা, বিধিনিষেধের বেড়াজাল কখনও তাঁর জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে স্তব্ধ করতে পারেনি। সাহিত্য জগতে স্বচ্ছন্দ বিচরণের পাশাপাশি নিজ পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের ছিলেন আত্মার আত্মীয়। সাহিত্য সৃজন, সংসার, সন্তান, চাকুরী জীবন সবকিছু পালনের সমান্তরালে তিনি সবসময় বটগাছ হয়ে আত্মীয় পরিমণ্ডলকে বিপদ-আপদ থেকে আগলে রাখতেন। যে কারো বিপদ আপদে তিনি সবার আগে এগিয়ে আসতেন। নিকট আত্মীয়দের অনুষ্ঠানের মেনু কার্ড-এ খাদ্যদ্রব্য তালিকাও তিনিই নির্ণয় করতেন। শুধু মিত্র নয়, শত্রুদের ওপর তাঁর অপার করুণা বর্ষিত হোত। তা যে সম্পর্কই থাক না কেন, তাদের বিপদ-আপদে সুচিত্রাদেবীই এগিয়ে এসে তাদের পাশে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার হাত বারবার বাড়িয়ে দিয়েছেন।

'স্মরণজিৎ ও সুচিত্রা ভট্টাচার্য' নামক প্রবন্ধে 'সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখায় ফেমিনিজম' নিয়ে তার বক্তব্য কি তা কে সাক্ষাতকারে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে — "... হ্যাঁ আমার লেখা নিয়ে এমন একটা অভিযোগ বা অনুযোগ আছে বটে! আসলে কী জানো, এখনও আমাদের সমাজে মেয়েরা খুব কোনঠাসা। তাদের প্রচুর কষ্ট আর অভিমান জমে রয়েছে। তাদের প্রচুর অভিযোগও জমে রয়েছে। আমার লেখায় সেই কষ্ট, অভিমান আর অভিযোগ ফুটে ওঠে। নারী লেখক হিসেবে আমি মেয়েদের দিকটা টেকনিক্যালি দেখতে ও দেখাতে পারি। নিজে মেয়ে বলেই পারি। পুরুষরা কিছুটা হলেও সেইসব কিছু রোমান্টি সাইজ করে ফেলবে। মেয়েদের ভেতরে জমে-থাকা প্রচুর দুঃখ, যন্ত্রণা বা অভিযোগগুলোকে রোমান্টিসাইজ করলে তার ভেতরের সত্যটা কোথায় যেন একটু লঘু হয়ে যায়। আমি সেই সত্যিটাকেই কোন মোড়ক ছাড়া আমার লেখায় তুলে ধরি। তাই কেউ সেটাকে মেয়েদের প্রতি পক্ষপাত করে লেখা বা ফেমিনিস্ট লেখা বলে বটে। কিন্তু আমি তা মনে করি না।"[৩] সমালোচকেরা তাকে 'নারীবাদী' লেখিকা অভিধায় ভূষিত করলেও তিনি সবসময় বলেছেন যে, তাঁর লেখনীতে সমাজ, নারী পুরুষ সম্পর্কের নানা খণ্ড খণ্ড নির্মাণ, বিচ্ছেদ, দুঃখ যন্ত্রণার ইতিবিত্ত তুলে ধরেছেন। সাহিত্যের দৃষ্টিতে অভিজ্ঞ নারী হৃদয়ের সঞ্চিত ভাবনারসে জারিত চরিত্রগুলির আঁতের কথা পাঠকমহলে সুচারু রূপে উপস্থাপন করেন। নারীর দৃষ্টিকোণে উঠে আসে সমাজে, পরিবারে উপেক্ষিত নারী হৃদয়ের গোপন রক্তাক্ত বেদনাবোধ। হলদে হেঁশেলের দায়িত্বভার সামলে নিজের জন্য একফালি মুক্তাকাশের স্বপ্ন একাধারে ছিল নিষিদ্ধ। ছেলেবেলা থেকেই সুচিত্রা ভট্টাচার্য খুব ডাকাবুকো হলেও পরবর্তীকালে শান্ত স্থিতধী ব্যক্তিত্বের মোড়কে নিজেকে আবৃত্ত করেন। নারীর অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত এই ছোট ছোট ভিন্ন আঙ্গিকের ভাবনাগুলোকে সাহিত্যের বয়ানে অত্যন্ত সাবলীল ও পরিশীলিত ভাবে ব্যক্ত করেছেন। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পরা মুক্তোদানার মতো অব্যক্ত নারীচেতনা স্তরের উত্তরণ-এর পথরেখার নির্দেশও আমরা পেয়েছি তার লেখনীতে। ফলে মানবজীবনে ঘটমান পরিস্থিতিগুলো সাহিত্যের দর্পনে সাবলীল ভাবে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এখানেই তাঁর লেখনীর ম্যাজিক।

লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য 'সই' নামক একটি সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে বহুবছর ব্যাপী সংযুক্ত ছিলেন। তাদের আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানে তিনি নির্দেশনার পাশাপাশি নিজেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি খুব ভালো নাচ জানতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলিতে তার মননঋদ্ধ নৃত্যশৈলী সকলকে মুগ্ধ করতো। পূর্বেও বলেছি যে সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য বা নারী সুচিত্রা ভট্টাচার্য-এর মধ্যে কখনও নিজ কৃতিত্ব সর্বসমক্ষে প্রচার করা বা আত্মগর্বে গর্বিত হওয়ার কোনে প্রবণতা ছিল না। মাটির মানুষ হওয়ায় নিজ সংসারে স্বামীর সঙ্গে কিংবা বাইরের জগতের সঙ্গে কখনও ঈর্ষা জনিত কোন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। বহুবার সাক্ষাতকার দেওয়ার সময় সুচিত্রা ভট্টাচার্য হাস্যমুখে উল্লেখ করেছেন তাঁর স্বামীর সহযোগিতার কথা। বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভ লগ্ন থেকেই তাঁরা উভয়ে একত্রে বহু সমস্যাদীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন। সাহিত্য জগতে যখন তিনি খ্যাতির শীর্ষে, সে সময় বেশির ভাগ সময়ে তিনি লেখনী জগতে আত্মমগ্ন থাকতেন। ফলে সাংসারিক দিকটিকে সেভাবে লক্ষ্য করতে পারতেন না। সুচিত্রাদেবীর স্বামী প্রদীপ মুখোপাদ্যায় সে সময় সংসারের কাজগুলোকে নিপুণভাবে সম্পাদন করতেন। সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর জীবনে প্রদীপ মুখোপাধ্যায়কে ছায়াসঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন বলেই তিনি লেখনী জগতে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিবেদন করতে পেরেছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এতো সুন্দর সমঝোতা পূর্ণ সম্পর্কের কারণেই সুচিত্রা দেবীর লেখনী সত্ত্বায় সেই ভালোবাসার ফল্গুধারাও প্রতিফলিত হয়েছে। ঢাকুরিয়ার বাড়িতে থাকাকালীন তিনি পূর্ণ সময় সাহিত্য জগতে নিমগ্ন থাকতেন। প্রদীপ মুখোপাদ্যায় সে সময়েও তাকে পূর্ণ সহায়তা করে গিয়েছেন। তাই সাক্ষাতকার পর্বে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তাদের যুগল সম্পর্কটি প্রথগত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ঊর্দ্ধে এক সুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আর তাই তিনি সাহিত্য সৃজনীকার হিসেবে নিজের সম্পূর্ণ সত্ত্বাকে সমর্পণ করেছেন সাহিত্য জগতে। দেখতেও ভীষণ মিষ্টি ছিলেন। প্রতিটি ফটোতে তার হাস্যমুখর মুখটি আলাদা ভাবে সৌন্দর্য ছড়ায়। কপালে গোল বড়ো লাল টিপ পরিহিতা স্নিগ্ধা সুচিত্রা ভট্টাচার্য আমাদের মননে নির্মিশেষ ভালোলাগার সঞ্চার করে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখনীতে সমাজ ও সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সেই যুগধর্ম কিভাবে মানুষের প্রাত্যহিক চাহিদার বদল ঘটিয়ে চলেছে, সাবেকী রীতিনীতিকে অস্বীকার করে ভোগবাদী জীবনযাত্রার রঙিন স্বপ্নে বিভোর, এই যুব সমাজকে তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর উপন্যাসের ক্যানভাসে। স্বাধীনতা উত্তর যুগের উষ্ণ রাজনৈতিক বাতাবরণ, ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতির দুর্বিপাকে বিপর্যস্ত বাঙালি জীবনধারা, তাদের সংগ্রামমুখর দিন, ভ্রান্ত আদর্শবাদের বৃত্তে ঘুরে মরা বিপ্লবী দল, তাদের নীতিবাদের আস্ফালন --- অপরদিকে পুঁজিবাদী শ্রেণির বাড়বাড়ন্ত, শোষণ-পীড়নের করুণ ইতিহাসও মুখর হয়ে ওঠে তাঁর লেখনীধারায়। কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মত ভাবাপন্ন না হয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণে সমাজে ঘটিত অন্যায়গুলির প্রতিবাদে চিরদিন সোচ্চার

হয়েছেন। কেউ তাঁর কণ্ঠরোধ করতে পারেনি। তাঁর কলমের শাণিত ধারা বারংবার সামাজিক অসঙ্গতিকে উল্লেখ করে গর্জে উঠেছে। সমাজ-এর চিরন্তন ধ্যানধারণায় নারী কেবলই উপেক্ষিতা, নির্যাতিতা। আর তাই তাঁর লেখনীতে নাররাই প্রটাগনিস্ট। নারী জীবনের অকথিত দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী, তাদের সংগ্রামমুখর জীবনযুদ্ধের কথা, সমাজে ও পারিবারিক জীবনে নির্যাতিতা হওয়ার। শৈশব থেকেই বিধিনিষেধের বোঝায় হতোদ্যম নারী জীবনের স্বপ্ন ভঙ্গের কাহিনী, আবার বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে উত্তরণের নোনাজলের ইতিহাস পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ভাবে সাহিত্যের দর্পণে তুলে ধরেছেন। সমাজের অসঙ্গতিগুলি আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে প্রশ্ন তুলেছেন সমাজের কাছে। উপন্যাস ছোটগল্পধারায় লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নর-নারীর জীবনকে দেখাবার এই অকপট স্বচ্ছ দৃষ্টি তাঁর লেখনীকে অনন্যতর মাত্রায় বিভূষিত করেছে। জীবনবোধে উন্নীত চরিত্রগুলি যেন আমাদের প্রাত্যহিক চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবিকেই সাহিত্যের পাতায় প্রতিফলিত করে। তাই তিনি পাঠকের হৃদয়ে সতত সমুজ্জ্বল।

প্রাত্যহিক জীবনে যেমন তিনি সব বয়সী মানুষের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মিশতেন, ঠিক তেমনি ভাবে নবীন লেখক লেখিকাগণকেও প্রচণ্ডভাবে ভিন্ন আঙ্গিকে লেখবার জন্য উৎসাহিত করতেন। আধুনিক প্রযুক্তিগত বিষয়েও তিনি বেশ দক্ষ ছিলেন। বর্তমান সময়ের অন্যতম সামাজিক মাধ্যম সযমন হোটাস্অ্যাপ, ফেসবুক, অরকুট, ই-মেল ইত্যাদি মাধ্যমগুলির মধ্য দিয়ে তিনি বৃহত্তর পাঠক সমাজ, নবীন-প্রবীণ প্রজন্মের লেখকমণ্ডলী — সবার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের বিষয়ে মনোগ্রাহী সমালোচনা সদর্থক নানা প্রতিক্রিয়া সরাসরি লাভ করতেন এই আধুনিক গণমাধ্যমগুলির মধ্য দিয়ে। পাঠকের আত্মতৃপ্তির মধ্য দিয়েই একজন সাহিত্য সৃজনীকারের সৃজনভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাই তাঁর লেখা নিয়ে আলোচিত প্রায় সমালোচনা পর্বগুলি নিবি ভাবে পাঠ করতেন। পরবর্তী লেখাকে আরো সুন্দর বাস্তবধর্মী করে তুলে সাহিত্য রসস্বাদু পাঠকের হৃদয়ের মণিকোঠায় সযত্নে রেখে দিতেন। নারী জগতের অব্যক্ত যন্ত্রণার সমান্তরালে নারী জীবনের উন্নতির পর্ব, তার সফলতার পর্ব, সমাজের বিধি নিষেধকে অতিক্রম করে নতুন দিগন্তে বাঁচবার পর্ব, বহু সমস্যাদীর্ণ পথ অতিক্রম করে স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার উজান ভরা অসমসাহসী নারী জীবনের কথকথা নির্দিষ্ট ঝকঝকে শব্দবন্ধে তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁর প্রতিটি গল্প-উপন্যাস তাই সুখপাঠ্য এবং দারুণ জনপ্রিয়। সকলের কাছেই তিনি ছোট বড়ো নির্বিশেষে ‘প্রিয় সুচিত্রাদি’ নামেই সমধিক বিখ্যাত। ব্যক্তিগত জীবনে কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। সত্য কথা অকপটে বলতে পছন্দ করতেন। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে কৃষকদের জমি আান্দোলনের সময় অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি তিনিও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। আবার কামদুনির তাপসী মল্লিক ধর্ষণ কাণ্ডের বীভৎসতায় তার প্রতি সুবিচার চেয়েও তিনি সংবাদ মাধ্যমে

সমালোচনা করেছিলেন। সর্বদা মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়েছেন কোন রক্তচক্ষুর তোয়াক্কা না করেই।

এরফলে অনেক সুধীজনের বিরাগভাজন হয়েছেন এবং বহু সম্মান পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁর 'রূপকথার জন্ম' গল্পটির ঋজুময়তা পাঠ করে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে এই পরিশীলিত লেখনী নিশ্চয় নারী ছদ্মনামে কোন পুরুষের। পরবর্তীকালে রাধানাথ মণ্ডল -এর সঙ্গে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ হয় সুচিত্রা ভট্টাচার্যের। অকপটে তাকে 'দেশ' পত্রিকার জ্য একটা লেখা দিতে বলেন। এতোটাই সহজ ও আন্তরিক ভাবে নবীন লেখকদের সঙ্গে আত্মস্থ হয়ে যেতেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। 'দিক শূন্য পুর' প্রবেন্ধে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন — ''পায়ের তলায় সরষে লাগানো সুনীলদা যে সহজ ভঙ্গিতে আধচেনা, অচেনা মানুষদের সঙ্গে মিশে যেতে পারতেন তা প্রায় অবিশ্বাস্য। এ ব্যাপারে কুশলতা ছিল তাঁর নিজের গদ্যের মতোই। সরল অনাড়ম্বর ভঙ্গি, কিন্তু কোথাও তা বিশেষত্ব হারাচ্ছে না। একটা হালকা লিরিক্যাল টাচ মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে এ মানুষটা শত সহস্র পাতা স্বাদু গদ্য লেখা সত্ত্বেও একজন কবি। ... কী বিপুল পড়াশোনা ছিল সুনীলদার! 'সেই সময়', 'পূর্ব পশ্চিম', 'প্রথম আলো'-র মতো তিন তিনখানা পিরিয়ড পিস এক জীবনে লিখেফেলা যে কী দুরূহ কাজ! এর মধ্যে 'সেই সময়' আর 'প্রথম আলো' তো রীতিমতো দুঃসাহসীক। বাঙালির আবেগ ভক্তির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষদের নিয়ে তিনি যেভাবে কাটাছেঁড়া করেছেন, পড়ে চমকে উঠতে হয়।''[৪] আজীবন তাঁর কাছে 'প্রিয় সুনীলদা' একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

'নারীবাদী' উপমায় তাকে বারবার বিদ্ধ হতে হয়েছে। তবুও তিনি অদম্য সাহসে ভর করে নারীদের আত্মকথনে তাদের অব্যক্ত যন্ত্রণার ইতিহাসকে সাহিত্যে মুখর করে তুলেছেন। এটা সত্যি যে, আজও দেশে কন্যাভ্রূণ হত্যার সংখ্যা, নারী নির্যাতনের সংখ্যা অনেক বেশি। এই সমস্যার মূল অনেক গভীরে প্রথিত। নারীদের পরম শত্রু-পিতৃতন্ত্রের ধ্বজাবাহী এক শ্রেণির নারীরাই। 'ছেলেমেয়েতে বিভেদ মেয়েরাই তৈরী করে' প্রবন্ধে তিনি এ ব্যাপারটি সম্পর্কে বলেন — ''... মেয়েরা যতই নিজেদের আপ-টু-ডেট ভাবুক, শিক্ষিত মনে করুক, বাইরের জগতে গিয়ে সেল্ফ ডিপেনডেন্ট হোক, সমাজে তাদের জায়গাটা খুব একটা স্পষ্ট নয়। কারণ, আমাদের ভাবনা-চিন্তা, অবস্থান পুরোটাই ভীষণ ঘোলাটে। মেয়েদের এই অবস্থার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সচেতনতার অভাব। মেয়েদের নিজেদেরই এই অবস্থাটা দূর করতে হবে। আর ছেলে মেয়েতে বিভেদ কিন্তু মেয়েরাই তৈরি করে। মা যদি ছোটো থেকেই ছেলেকে শেখান স্ত্রীকে যোগ্য সম্মান দিতে হবে, তাহলে ভবিষ্যৎটা অন্যরকম হয়। মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো গোলমাল তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমঝোতা করে চলে। তাদের এই আপসের জায়গাটা থেকে বেরিয়ে

আসতে হবে।”[৫] সমাজে মেয়েদের এই অসহায় অবস্থাগুলোকে নিজের চোখে অবলোকন করেছিলেন বলেই তাঁর লেখনীতে এই বিষয়গুলো এতো স্বচ্ছ ভাবে প্রতিকায়িত হয়েছে। গৃহবধূ নারীদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে তাদের সে সব ব্যাপারে বাড়ির কর্তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। প্রথাগত নিয়মনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে তাদের বাঁচবার আশাটাই ক্ষয়ে যায়। রান্নাঘরে দিনযাপন করা এই সব নারীদের কাছে একমুঠো অক্সিজেন মেয়েলি আড্ডা। দুপুর বেলার পড়ন্ত রোদ পিঠে লাগিয়ে সবাই মিলে বসে নানান গল্পগাছা, সমস্যা সমাধান, পরনিন্দা পরচর্চা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আশ্রিত তাদের সভাটি রীতিমতো সরগরম থাকে। এটা সম্পূর্ণ মেয়েদের এর নিজস্ব পরিমণ্ডল যেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। শাশুড়ি বউমার তরজা থেকে প্রজন্মব্যাপী মেয়েদের ওপর অত্যাচার এর কাহিনী, অসুখী জীবনের চাপা দীর্ঘশ্বাস — এসব বিষয়গুলো সুচারু রূপে তিনি উপস্থাপন করেছেন তার লেখনী ধারায়। আবার চাকুরীজীবী নারী পরিমণ্ডলের আড্ডা আলোচনা, ডিজিটাল মাধ্যমের আড্ডা, তাদের জীবনের অব্যক্ত কাহিনী — কোথাও যেন মিলেমিশে এক হয়ে যায়। নারী-পুরুষ একত্রে সংসার গড়ে তোলে — একথাটা আপ্ত বাক্য মাত্র। সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে নারীরাই আধার রূপে পুরুষ ও তার যাপিত জীবনকে একটা সুন্দর অবয়ব দান করেছে। শৈশব থেকে রান্নাবাটি খেলার মধ্য দিয়ে খেলার ছলেই মেয়েরা সংসার নামক স্বপ্নটি দেখতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন রীতি নীতি আচার বিধির মধ্যদিয়ে তা ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে। যেকোন পরিস্থিতিতেও তারা সংসারকে রক্ষা করে চলে, পরম মমতায় আগলে রাখে। পরিবারের ছোট বড়ো সকলের সবরকম চাহিদা, অনুভূতিগুলির যথাযোগ্য মর্যাদা ও যোগান দিয়ে সকলকে একত্রে ভালোবাসায় একত্রিত করে রাখে। নারী জীবনের এই প্রতিটি পর্যায়, অনুভূতিগুলোকে একজন নারীর চোখে জরিপ করে তা অপূর্ব শব্দবন্ধে গল্প-উপন্যাসের সুবিশাল পরিসরে ব্যক্ত করেছেন। একজন নারীর পক্ষেই সম্ভব এতোটা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ভাবে নারী জীবনের উত্থান-পতন, তার ভাবনা বোধ, চেতনা প্রবাহের উত্তরণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উজান ভরা স্বপ্ন ঘিরে বাঁচা, সংগ্রাম মুখর দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক ও বর্হিজগতে লাঞ্ছনার গোপন ক্ষত, স্বপ্ন ভঙ্গের যন্ত্রণা, বিশ্বাসহীনতার রক্তাক্ত অধ্যায়, প্রতিকূল পরিবেশ থেকে একা লড়াই করে স্বাবলম্বী হওয়ার কথাগুলোকে শব্দের ছকে বেঁধে তাকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করা। সুচিত্রা ভট্টাচার্য সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই অগ্রগণ্যা।

তাই তিনিই অকপটে বলতে পারেন — ‘‘... মুখে যতই বলা হোক না কেন, নারী-পুরুষ হাতে হাত মিলিয়ে সংসার রচনা করে, কিন্তু আদতে কী তাই? যে অদৃশ্য বাঁধুনি শক্তি একটা সংসারকে ধরে রাখে, যার অভাবে একটা পরিবার পুরোপুরি পরিবার হয়ে উঠতে পারে না, সেই শক্তির কতটুকুই বা জোগায় ছেলেরা?

ঘরতো মেয়েরাই গড়ে। লালন-পালনও করে মেয়েরাই। আবার সেই মেয়েকেই কাজের জায়গায়

প্রতি পদে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়, সেটা তাদের আর একটা লড়াই। জীবিকার জন্য সে সংসারকে কতটা কম সময় দেবে, কিংবা সংসারের জন্য সে তার উচ্চাশাকে লাগাম পরাবে কিনা, এই টানাপোড়েন তো মেয়েদেরই। ছেলেদের নয়। এখনও।"[৬] উপন্যাস ছোটগল্পের আসরে তাঁর পরিণত মনস্ক ভাবনাগুলির বিচ্ছুরণ দেখতে পাই। মেয়েরা তাদের স্বাধীকার রক্ষার এগিয়ে এসেও তারা সংখ্যায় খুব নগন্য। যাদের পক্ষে সমাজে নারীদের অবমাননা, লাঞ্ছনা, নিপীড়ন এর হাত থেকে রক্ষা করা, কিংবা অস্তিত্বের সংকটে ভোগা নারীকে সর্বত ভাবে সাহায্য করা সম্ভবপর না হলেও তাদের পথ প্রদর্শন করতে পারাটা অবশ্যই সম্ভব। আধুনিক সমাজে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে অদ্ভুত দোলাচলতা, সংকট উপস্থিত — যার ফলে পারিবারিক যে একাত্মতা, নৈকট্যবোধ, স্নেহমমতা — এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই অদ্ভুত অস্থির বর্তমান সময়কালকে তিনি যথার্থ ভাবে তাঁর উপন্যাস-এ তুলে এনেছেন। এই যে সমাজ পরিবার সময় রীতিনীতি ব্যক্তিমানুষের আত্মসংকট নিরাপত্তাহীন একাকীত্বে মোড়া বোহেমিয়ান জীবন-একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন-বিশ্বাসহীনতা-ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ-অবক্ষয়ী দিশাহীন যুবসমাজ — এসব বর্তমান নগর জীবনের অন্যতম বিষময় ফল। একটা পূর্ণাঙ্গ সময়কালকে লেখনীর মধ্যে তুলে এনে তার নিরিখে বদলে যাওয়া জীবন-বোধকে সার্থক চরিত্রায়নের মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। বাংলা সাহিত্যে বিশ ও একুশ শতকের সমাজ ভাবনা, মানব জীবন ও তাদের চেতনাস্তর, সময়, সংকটকাল ও তা থেকে উত্তরণের পথ অন্বেষণ এই সামগ্রিক পূর্ণয়ত রূপরেখা উঠে এসেছে ঔপন্যাসিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কলমের ডগায়। ভাবনা জগতে কিছুটা শরৎচন্দ্র ও আশাপূর্ণাদেবীর অনুসারী হলেও মানব জীবনকে অবলোকন করবার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীটাই ছিল একান্ত নিজস্ব ও অনন্য। তাঁর ব্যক্তি জীব, পারিবারিক জীবন-এর পাশাপাশি কর্মজীবনে জাত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি ছিল বৃহৎ। অসাধারণ মানসিক জোর, মেধা ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারাকে সঙ্গী করে সাহিত্য জগতে পুরুষ লেখকদের সমান্তরালে মহিলা কথাকার হিসেবে নিজস্ব পরিচিতির স্বাক্ষর সৃজন করেছিলেন। নিঃসন্দেহে কাজটি অত্যন্ত দুরূহ।

তাঁর জীবনের দুটি অজানা কাহিনীর কথা ও উল্লেখ করছি। আশির দশকের প্রথম দিকে তিনি একটি গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহী হন ও কলেজ স্ট্রীটের এক প্রকাশকের সঙ্গে পরিচিতি হয়। সুচিত্রাদেবীই সমস্ত খরচপত্র বহন করবে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়ে প্রকাশকটি তার গল্প সংকলন ছাপানোয় রাজি হন। তাকে অগ্রিম টাকাও দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরে সে কাজ নিয়ে বিস্তর টালবাহানা করতে আরম্ভ করে। শেষে প্রতারণার দায়ে পুলিশে খবর দেওয়া হবে ভয় দেখালে কিছুটা কাজ হয়। শেষ পর্যন্ত এই বই ছাপিয়ে দেয়। তবে বইটির দৈন্যদশা দেখে তো সুচিত্রাদেবী প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলেন। এতোটাই নিম্নমানের কাজ হয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকে তিনি অজানা প্রকাশকদের কাছ থেকে দূরেই থাকতেন। আর একটি বিষয় যা প্রায় সত্তরের দশকের

মাঝামাঝি সময়কালের কথা। ঢাকুরিয়াতে বসবাস কালে তাঁর মনে এক অদ্ভুত নেশার সঞ্চার হয়। ঢাকুরিয়ার এক হাফ জ্যোতিষী মুকুল-এর সঙ্গে গিয়ে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে বসে থাকতেন ঘন্টার পর ঘন্ট। কাঠে শব দাহ হোত, সে দিকেই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। প্রায় বছর দুয়েক এই পর্ব চলেছিল। এরপর স্বামী ও অন্যান্যদের বোঝানোতে এই অভ্যাস দূর হয়। তবে দীর্ঘসময় শ্মশানে কাটাবার জন্যই তিনি আস্তিক থেকে চরম নাস্তিক ও প্রখর যুক্তিবাদী হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখনী ধারাতেও বহুবার প্রথাগত ধর্ম পালনের অসারত্ব বিষয়টি উঠে এসেছে। তিনি যে কোন বিষয়কে যুক্তিবাদের আলোকে নিরীক্ষণ করে তবেই সন্তুষ্ট হতেন।

এই সময়কালের প্রায় আট-দশ বছর পর আরও এক আজব নেশায় আসক্ত হয়েছিলেন তিনি। আত্মীয় কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় তার লেখা 'অকথিত' নামক প্রবন্ধে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন — ''... তার গৃহ পরিচারিকার ছিল এক মুসলমান বিধবা, নাম ছিল তার অছিরন বিবি, বিধবা হওয়ার কারণে অছিরণবেওয়া। সে থাকত ঘুটিয়ারি শরিফের কাছে কারখানার চক নামের এক গ্রামে। দেওর-ভাসুর থাকলেও মেয়ে শাকিলা আর দুই ছেলেকে নিয়ে বড়ো কষ্টে দিনপাত করত অছিরণ। সুচিত্রা তখন প্রায় নিয়মিতই চলে যেত তার গ্রামে, সারাটা দিন কাটিয়ে আসত অছিরণের বাড়িতে, ঘুরে ঘুরে বেড়াত কারখানর চকের ঘরে ঘরে। তাদের দাওয়ায় বসে গল্প জুড়ত, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানতে চাইত তাদের জীন যাপনের ধারা, তাদের সুখ-দুঃখের উপাখ্যান, সংগ্রামের খুঁটিনাটি। সেই অছিরণ হঠাৎ আক্রান্ত হল যক্ষায়, তাকে ডাক্তার দেখানো, ওষুধ খাওয়ানোর দায়িত্বও সুচিত্রা তুলে নিয়েছিল নিজের ঘাড়ে। তখনও তার নিয়মিত কারখানার চকে যাওয়ার ছেদ পড়েনি। এই সময়েই তার কলমে উঠে এসেছিল অন্ত্যজ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে 'রূপকথার জন্ম', 'দাফন', 'আজ্জান', 'কালোছায়া সাদা ছায়া', 'প্লাবনকাল', 'বাদামী জড়ুল', 'দাগবসন্তী খেলা', 'মানুষ যেমন' ইত্যাদি স্মরণীয় সব গল্প।''[৭] শুধু তাই নয়, সমাজ সেবামূলক কাজেও তিনি সর্বদা এগিয়ে আসতেন। সময়টা ২৫শে মে ২০০৯ সাল। সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় 'আয়লার' ভয়ানক প্রভাব দেখা দেয়। পরদিন বিষদে জানতে পারা যায়। ভয়াবহ বন্যায় সমস্ত দ্বীপাঞ্চল পুরোপুরি প্রায় ধ্বংস। তাদের কাছে না আছে মাথা গোঁজার ঠাঁই, না খাবার, না পোষাক-আসাক কিছু নেই। সম্পূর্ণ গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অভুক্ত অবস্থায় মানুষ খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাচ্ছে। খাদ্য তো দূর কথা, পানীয় জলটুকুও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই সংবাদ জানতে পেরে সুচিত্রাদেবী কিছু পোষাক ও যথাসাধ্য অর্থ পাঠিয়ে দিলেন। সোনারপুরে অন্যান্য ক্লাবের সঙ্গে কথা বলে আরো সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি অসুস্থ মুর্মুষু মানুষদের চিকিৎসার ভারও তিনি দিয়েছিলেন ডাক্তারদের। বিপন্ন মানুষদের প্রতি তার এই দের্থক সেবাভাব সারা জীবন সকলের মনের মণিকোঠায় আবদ্ধ হয়ে থাকবে। 'দম্‌কা হাওয়া' উপন্যাসটি রচনার সময় তার বাম হাত ভেঙেছিল। সে সময় সুচিত্রাদেবী বামহাতে রান্না করা, চাকরীর প্রয়োজনে লেখার প্রয়োজনে বাম হাতে টাইপ করতেন।

কোন রকমের প্রতিকূলতা তাঁকে তাঁর কর্মজগৎ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। শুধুমাত্র মনের জোরে তিনি এতো ব্যথা সহ্য করেও সাহিত্য সৃজন অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর এই স্থিতধী মানসিকতা অবহ্যই প্রশংসনীয়।

অত্যন্ত ধৈর্য্যশীলা ছিলেন লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য। সাহিত্য জগতে পদার্পনের পর বহুবছর তাকে নানান বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কাচের দেওয়াল' উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর তা পাঠক সমাজে বিপুল ভাবে সমাদৃত হয়। ঠিক তার পরের বছর আনন্দ পাবলিশার্স থেকে নববর্ষের দিন বইটি প্রকাশিত হয়। সেখানে তৎকালীন 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে সুচিত্রা দেবীর সাক্ষাত হয়। তিনি 'কাচের দেওয়াল' উপন্যাসটির ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁকে তাড়াতাড়ি দেশ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় লিখতে ডাকা হবে। এই আনন্দ সংবাদটি 'গল্পচক্র' গোষ্ঠীর বাকি সদস্যদের জানালে দু-একজন বাদে বাকিরা বিদ্রূপে ভরিয়ে দেন। সে বছর পুজোর পর সত্যি সাগরময় ঘোষ তাঁকে উপন্যাস লেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লেখেন। যে সময় তিনি পত্রটি পান, সে সময় তার বাড়িতে 'গল্পচক্র' গোষ্ঠীর এক সদস্য ছিলেন। তিনি চিঠিটি পাঠ মাত্রই পাংশু মুখে সুচিত্রাদেবীর বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যান। তিনি প্রতি সপ্তাহে সুচিত্রা দেবীর বাড়িতে আসতেন। ঐ ঘটনার পর আর কখনও তিনি সেখানে আসেননি। সুচিত্রা দেবীর মেয়ের বিয়েতে আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও তিতনি ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। তবে বেশ কয়েকবছর পর ঐ লেখকের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে আমন্ত্রণ জানালে সুচিত্রাদেবী ঐ লেখকের বাড়ি গিয়ে তার মেয়েকে শুভাশীর্বাদ করে এসেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঈর্ষা মানুষের সৃজন ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে দেয়। তবে মধুর ব্যবহার মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীক মিলনের পথ প্রশস্ত করে। তিনিও নিজের সুমধুর ব্যবহার দিয়ে পুরোনো তিক্ত অভিজ্ঞতার অবসান ঘটিয়েছিলেন পাশাপাশি নিজের আত্মমর্যাদাকেও বজায় রেখেছিলেন। প্রকৃত গুণী মানুষ তো এমনই হন।

তবে বড়ো অসময়ে বাংলা সাহিত্য জগৎ ও অগুনতি গুণমুগ্ধ পাঠককে অশ্রুজলে সিক্ত করে তিনি পরপারে পাড়ি দিলেন। জীবনের শেষ পর্বে তিনি হার্টের সমস্যায় বেশ জর্জরিত ছিলেন। তিনি নিজেই জানিয়েছেন — ''বেশকয়েক বছর হল আমার হৃৎপিণ্ডে কিঞ্চিৎ গোলযোগ ধরা পড়েছে। অসুখটার নাম কার্ডিয়োমায়োপ্যাথি। চিকিৎসাপত্রও চলছে নিয়মিত। ... ভালোমতোই জানি কার্ডিয়োমায়োপ্যাথি অসুখটাই ভারি বিচ্ছিরি। ম্যালেরিয়া-টাইফয়েডের মতো নয়। পুরোপুরি কখনো সারে না। ডাক্তারি পরিভাষায় এধরণের অসুখকে বলে নন-কিউরেবল ডিজিজ।" [৮] তাই মাঝে মাঝেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তবে তাই বলে লেখালেখি, সভাসমিতিতে যাওয়া, টিভিতে সাক্ষাৎকার দেওয়া এসব তিনি সবসময় করতেন। সমস্যাকে সমস্যা বলে কখনই মনে করতেন না। তবুও শেষরক্ষা হল না। ২০১৫ সালের

১২ই মে তাঁর জীবনের শেষ দিন। ঐ দিন রাত ৯টা পর্যন্ত 'শারদীয়া দেশ' এর জন্য লেখেন। সকলের সঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে রাত সাড়ে দশটায় একটা ওষুধ খান। ওষুধটা খাবার পর থেকেই তিনি অসুস্থ বোধ করেন। ঘরে এ. সি চালিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েন। এই শোয়াই তার শেষ শোয়া। প্রতিবেশী ডাক্তার এসে বুকে পাম্প করে তাঁকে বাঁচানোর জন্য প্রচুর চেষ্টার করেও অসফল হন। পরদিন ১৩ই মে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মাত্র ৬৫ বছর বয়সে তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য জগতের অপরিমেয় ক্ষতি হয়। রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই সুচিত্রা ভট্টাচার্য বিরচিত বহু সুখপাঠ্য সাহিত্যের রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়। তবু সাহিত্য পিপাসু মানুষের হৃদয়ে তিনি সদাসর্বদা চিরশ্রদ্ধার আসনে বিরাজমান রইবেন।

সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য শৈশবকাল থেকেই সাহিত্যের রসাস্বাদনে আগ্রহী ছিলেন। মেয়ের সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ দেখে তার বাবা ধীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁকে আরো অনুপ্রাণিত কেরন। ছেলেবেলায় নানান কবিতা লিখতেন বলে তাই তাঁকে লেখবার জন্য তাঁর বাবা দুটো লাল ও সবুজ রঙের খাতা দিয়েছিলেন। লাল খাতায় থাকত রকমারি লেখা। যেমন দুপুরে লুকিয়ে আচার খাওয়ার গল্প, চড়ুইভাতির গল্প ইত্যাদি। আর সবুজ খাতায় অন্য ধরণের গল্প লিখতেন। একবার এক প্রেমের গল্প লেখেন। বাবার সহযোগিতায় পরবর্তিতে আরও অনেক ভালোবাসার গল্প রচনা করেন। স্কুলে পড়াকালীন তার অনেক লেখা স্কুল ম্যাগাজিনে বেড়িয়েছিল। ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস হাইস্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়বার সময় তাঁর লেখা প্রথম ছড়া 'চড়ুই' প্রকাশিত হয়। বালিগঞ্জের বাড়ির বারান্দায় নৃত্যরত দুটো চড়ুইকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই কবিতা লিখেছিলেন।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সাহিত্য জীবন তিনটি অধ্যায়ে বিভাজিত। স্মরণজিৎকে দেওয়া সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়েছেন — ''আমার লেখার মোটামুটি তিনটি ভাগ আছে। প্রতম ভাগটা ধরো এই ইলেভেন-টুয়েলভ অবধি লেখা। ছেলেমানুষির লেখা। সে সব পড়া যায় না বা পাতে দেওয়া যায় না! তবে সেসব ওই স্কুল ম্যাগাজিনে বেরোত। ... এর পরের দশ বছর আমি লেখা থেকে একদম সরে গিয়েছিলাম। আঠারো থেকে আঠাশ — এই দশ বছর ছিল আমার লড়াই আর সংগ্রামের সময়। এই সময় আমার জীবনে নানারকম ওঠাপড়া গিয়েছে। ... তারপর এই সাতাশ-আঠাশ বছর সময়টায় আমি তখন চাকরির পাশাপাশি এম. এ পরীক্ষা দেব বলে পড়াশোনা করছি। ... এমন করে টুকটাক লিখতে শুরু করলাম আর এখানে-ওখানে পাঠাতেও লাগলাম। কিছু ছাপা হত, কিছু ফেরত আসত। এমন করেই চলছিল। এটা হচ্ছে আমার লেখালেখির দ্বিতীয় স্টেজ। সত্তরের দশকের শেষাশেষি আমি ভালোভাবে লেখার জগতে এলাম। ... তারপর বিরানব্বই সালে রমাপদদা, রমাপদ চৌধুরী আমায় বললেন, আনন্দ বাজারের জন্য একটা উপন্যাস দিতে। সেই আমি আনন্দবাজারের জন্য প্রথম উপন্যাস লিখলাম 'কাচের দেওয়াল'। সেই লেখাটা পাঠক-মহলে এমনভাবে গৃহীত হল, এমন সাড়া ফেলল যে, আমার নিজের মনে হল, আরে, আমার নিজের তো কিছু বলার আছে! ...

এই বিরানব্বই থেকে আমার লেখক জীবনের তৃতীয় পর্যায়ের শুরু।"[৯] সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখনী জগতের নতুন পর্বের সূচনা ১৯৭৮-১৯৭৯ সাল। সে সময় তিনি শখের বশে গল্প লিখতেন। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে 'কাচের দেওয়াল' প্রকাশিত হলে তা পাঠক সমাজের বহুল সমাদৃত হয়। এই সময় তাঁর মধ্যে এক নতুন অনুভূতির সৃজন হয়। চারপাশের জগৎটাকে নিজের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে অনুভবের রসে জারিত করে তিনি তাকে সাহিত্যের বৃহৎ পরিসরে উপস্থাপন করেন। তিনি বেশ বুঝতে পারেন যে ছেলেবেলা থেকে যা নিছক খেলামাত্র ছিল, তা পরিণত হচ্ছে নেশায়। লেখক ও পাঠকের মধ্যে যে অদৃশ্য সেতু রচিত হলে লেখক রসজ্ঞ পাঠকের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে বিরাজমান হয়, সেই সেতুটাকে তিনি অনুভব করেন ১৯৯২ সালে। সমাজ, জীবন, সময়কালের প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবনে উত্থিত জটিলতা ও তার থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে চলা নর-নারীর বিচিত্র এবং বহুধা সংগ্রামের বাস্তব কাহিনীগুলোকে তিনি সাহিত্যের অঙ্গনে তুলে ধরেছেন। অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বাদ ঝরঝরে লেখনী ধারায় তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি হয়ে উঠেছে সুপাঠ্য। ফলে অচিরেই তা পাঠক হৃদয়ের অন্তরালে নিজের স্থান লাভ করে নিতে সফল হয়েছে। লেখক ও পাঠকের হৃদয়ের এই অপরূপ মেলবন্ধন সম্পর্কে তিনি বলেছেন — ''সবকিছুই তো আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা আর অনুভূতিতে জারিত হয়ে উপন্যাসের রূপ পেতে পারে। আমার লেখা যদি একজন পাঠকেরও অন্তর ছুঁয়ে যায়। সেটাই তো আমার বিরাট প্রাপ্তি।"[১০]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে রাধানাথ মণ্ডল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'গল্পচক্র' নামক এক লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে সুচিত্রা ভট্টাচার্য যুক্ত ছিলেন। গল্পচক্রের লিটল ম্যাগাজিন 'ঋতুপত্র গাঙ্গেয়'-তে সুচিত্রাদেবীর 'রূপকথার জন্ম' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি পাঠক মহলে প্রবলভাবে সমাদৃত হয়। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই গল্পটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। সচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা প্রথম প্রকাশিত গল্প 'উত্তর প্রবাহ'। ১৯৭৮ সালে 'সিনেমা জগত' পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। ১৯৮৮ সালে তাঁর লেখা প্রথম গল্পগ্রন্থ 'রূপকথার জন্ম' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রথম গল্প 'বাদামি জড়ুল' প্রকাশিত হয়। তিনি প্রায় ২০০টি গল্প লিখেছেন। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে পদার্পণ করেন। ১৯৮৪ সালে রচিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'যখন যুদ্ধ'। তবে এই উপন্যাসটি নিখিলেশ বিশ্বাস সম্পাদিত 'রোচনা' পত্রিকায় 'সূর্যাস্তের ময়ূর' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে ১লা ফেব্রুয়ারি কলকাতা বইমেলায় 'সংবাদ প্রকাশন' থেকে 'যখন যুদ্ধ' নামে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় উপন্যাস 'আমি রাইকিশোরী' কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ঋতুপত্র গাঙ্গেয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯৯২ সালে তৃতীয় উপন্যাস 'কাচের দেওয়াল' আনন্দবাজার পত্রিকা শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মূলত এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই তাঁর লেখনীর উৎকর্ষতা সকলের

কাছে ছড়িয়ে পরে। ১৯৯৪ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কলকাতার বুকে ঘটে যাওয়া এক সত্য ঘটনা অবলম্বনে 'দহন' উপন্যাসটি। ১৯৯৫ সালের নবেম্বর মাস থেকে ১৯৯৭ সালে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর রচিত বৃহৎ উপন্যাস 'কাছের মানুষ'। এই উপন্যাসটি দুর্গাপূজা সময় দোর বন্ধ করে লেখা আরম্ভ করেছিলেন। দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ সাইকেল মেসেঞ্জারের মাধ্যমে লেখা সংগ্রহ করতেন। এই উপন্যাসটি রচনা প্রসঙ্গে লেখিকা জানিয়েছেন — "... 'কাছের মানুষ' লিখতে গিয়ে অদ্ভুত একা ব্যাপার ঘটত। একরকম ভেবে হয়তো লিখতে বসলাম। কিন্তু গল্প কেমন যেন নিজেই নিজেকে লিখিয়ে নিত। আমি লিখতাম বটে, কিন্তু কলম যেন আমার হাতে থাকত না! চরিত্ররা নিজেদের গতিতেই চলতে শুরু করত। পরে অনেক ভেবেও এমন কেন হত, তা আমি ধরতে পারিনি।"[১১] এই উন্যাসটি অপরিমেয় জনপ্রিয়তা লাভ কসর। নর-নারীর জীবনের বিভিন্ন পর্বে উত্থিত সমস্যাগুলোকে অত্যন্ত যত্নে তাদের টানাপোড়েনের কাহিনীগুলোকে স্বাদু লেখনীতে পরিবেশন করেছেন। ফলে আপামর সাহিত্য রসজ্ঞ পাঠকের হৃয়মণ্ডলে সুচিত্রা বট্টাচার্য ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধা পরেন। 'কাছের মানুষ' উপন্যাসটিতে মানবমনের গভীর মনঃস্তত্বের সুক্ষাতিসুক্ষ্ম বিষয়গুলি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে মনের টানাপোড়েনের এই সত্যগুলো পাঠক মনের সত্যরূপে চিহ্নিত হয়, আর লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য সমগ্র বাঙালি পাঠকের হৃদয়ে ভালোবাসায় অবগাহন করেন। লেখিকা হিসেবে পাঠক মনের তৃপ্তিসাধন সবচেয়ে বড়ো পুরষ্কার। সুচিত্রাদেবী অগুণিত পাঠক হৃদয়ে এভাবেই তাঁর ভালোবাসার স্থানটি সিঞ্চন করে নেন। তিনি প্রায় ছাপ্পান্নাটি উপন্যাস রচনা করেন। মৃত্যুর পর প্রকাশিত দু'টি উপন্যাস ('এই মোহমায়া' আর 'কাঁটা বেঁধা পায়ে') 'অসম্পূর্ণা' নামে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যে মহিলা কথাকার রূপে তিনি প্রথম সার্থক মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র 'মিতিন মাসি'-র স্রষ্টা। যার ভালো নাম 'প্রজ্ঞা পারমিতা মুখার্জি'। যিনি তুখোর বুদ্ধিমতী। যে কোন সমস্যাকে গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করে তার সমাধান করেন। মাঝে মাঝে তার স্বামী পার্থ থাকে সহকারী হিসেবে সাহায্য করেন। তাঁর লেখা প্রতম গোয়েন্দা উপন্যাস 'পালাবার পথ নেই' রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম গোয়েন্দা গল্প 'মারণ বাতাস' 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে তিনি প্রতি বঝর 'আনন্দমেলা' পত্রিকায় বছরে একটি করে মিতিন মাসি রহস্য উপন্যাস লিখতেন। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। যেমন — 'শিক্ষার হদ্দমুদ্দ', 'ধর্মঘটে রাজি কাজের বেলায় পাজি', 'ভাতের বদলে ভাতা', 'সৌন্দর্য এখন ব্যবসা' ইত্যাদি। এর সমান্তরালে তিনি বেশ কিছু পত্রিকা সম্পাদনাও করেছিলেন। যেমন 'ছুটির সময়', 'ছুটির দেশ' পত্রিকাগুলি। তাঁর লিখিত গল্প উপন্যাসগুলি অবলম্বন করে বহু সিনেমা তৈরী হয়েছে। পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ 'দহন' সিনেমাটি নির্মাণ করে জাতীয়

পুরষ্কার-এ ভূষিত হন। এছাড়া পরিচালক পিনাকী চৌধুরী সুচিত্রা ভট্টাচার্য বিরচিত 'গভীর অসুখ' উপন্যাসটি অবলম্বনে 'ক্যানসার' নামক সিনেমা নির্মান করেন। 'দহন' সিনেমাটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এছাড়া অলীক সুখ, হেমন্তের পাখি উপন্যাস দুটিও চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। 'রঙিন পৃথিবী' উপন্যাসটি 'টলিলাইটস নামে সিনেমা নির্মিত হয়েছে। 'রামধনু রং' গল্পটি অবলম্বন করে শিবপ্রসাদ মুখার্জি ও নন্দিতা রায় নির্মাণ করেন 'রামধনু' চলচ্চিত্রটি। আত্মজকে ঘিরে মায়ের ইচ্ছেগুলি আরোপিত হওয়ার কাহিনী উঠে আসে 'ইচ্ছের গাছ' গল্পটি অবলম্বনে রচিত 'ইচ্ছে' সিনেমাটির মাধ্যমে। সিনেমাটি প্রবলভাবে সমাদৃত হয়। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত চেতনাকে ভাষ্যে রূপ দেওয়ার নিপুণ কারিগর হলেন সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তাঁর লেখা অনেক গল্প উপন্যাসগুলি অন্যান্য ভাষাতেও অনুদিত হয়েছে। যেমন 'ভাঙনকাল' উপন্যাসটি ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় 'পরবাস' উপন্যাসটি হিন্দি ভাষায় 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসটি ইংরেজি ভাষায়, 'কাছের মানুষ', 'নীলঘূর্নি', 'ছেঁড়াতার', 'কাচের দেওয়াল', 'উড়োমেঘ' হিন্দি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ফলে সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের রসে জারিত গল্প উপন্যাসগুলির স্বাদ অন্যান্য ভাষাভাষী সম্পন্ন পাঠকের অন্তরেও একফালি উষ্ণতার তাপ রেখে যায়।

সাহিত্যাঙ্গনে তার অসাধারণ প্রতিভার জন্য তিনি অজস্র পুরস্কার, সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। নিম্নে তার পুরস্কার প্রাপ্তির একটি তালিকা সংযোজিত হল —

১। নাঞ্জানাগুদু থিরুমাল্বা জাতীয় পুরস্কার, ব্যাঙ্গালোর (১৯৯৬)

* কর্ণাটকের শাশ্বতী সংস্থা লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে তার রচিত 'দহন' উপন্যাসের জন্য এই পুরস্কারটি প্রদান করে।

২। কথা পুরস্কার (১৯৯৭) দিল্লী

৩। তারাশংকর পুরস্কার (২০০০) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৪। দ্বিজেন্দ্রলাল পুরস্কার (২০০১) কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়

৫। শরৎ সাহিত্য পুরষ্কার (২০০২) ভাগলপুর

৬। ভূবনমোহিনী স্বর্ণপদক (২০০৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৭। শৈলজানন্দ স্মৃতি পুরস্কার (২০০৪)

৮। ভারত নির্মান পুরস্কার

৯। সাহিত্য সেতু পুরস্কার

১০।ইন্দু বসু স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার

১১।মতি নন্দী পুরষ্কার

১২।দীনেশ চন্দ্র স্মৃতি পুরষ্কার ইত্যাদি।

তিনি মনে করতেন — ''আমি মনে করি পাঠকদের পুরস্কারই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার। একজন পাঠকও যদি বলেন, আমার অমুক লেখাটা পড়ে তাঁর ভালো লেগেছে, আমার মনে হয় আমি খুব বড়ো একটা পুরস্কার পেয়ে গেলাম।''[১২]

নিম্নে সুচিত্রা ভট্টাচার্য রচিত ছোটগল্প, উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল।

## কিশোর উপন্যাস

| | | |
|---|---|---|
| ১। ভাঙা ডানার পাখি | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯। |
| ২। সারান্ডায় শয়তান | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩। |
| ৩। জোনাথনের বাড়ির ভূত | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৪। |
| ৪। পেয়ালায় কিস্তিমাত | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫। |
| ৫। সর্পরহস্য সুন্দরবনে | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬। |
| ৬। ঝাও কিয়েন হত্যারহস্য | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭। |
| ৭। ছকটা সুডোকুর | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮। |
| ৮। আরকিয়েলের হিরে | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯। |
| ৯। দাবানলের দেশে | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০। |
| ১০। গুপ্তধনের গুজব | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০। |
| ১১। হাতে মাত্র তিনটে দিন | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১। |
| ১২। কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ | — | প্রকাশক : পত্রভারতী, ২০১২। |
| ১৩। মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যুফাঁদ | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩। |
| ১৪। টিকরপাড়ার ঘড়িয়াল | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪। |
| ১৫। দুঃস্বপ্ন বারবার | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫। |
| ১৬। স্যাণ্ডর সাহেবের পুঁথি | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৬। |

## কিশোর গল্প ও উপন্যাস

| | | |
|---|---|---|
| ১। জার্মান গণেশ | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯। |
| ২। মাঝরাতের অতিথি | — | প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫। |
| ৩। শেষ শান্তিপুর লোকাল | — | প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯। |
| ৪। শুধু ভূত | — | প্রকাশক : সাহিত্যম, ২০১০। |
| ৫। হাসি মজা ডট কম | — | প্রকাশক : পত্রভারতী, ২০১১। |

৬। গপ্পোসপ্পো বত্রিশের ধাক্কা — প্রকাশক : পত্রভারতী, ২০১৩।

৭। মিতিনমাসি সমগ্র (১ম খণ্ড) — প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪।

## বিবিধ

১। খোলামন — প্রবন্ধ সংকলন, ক্যাম্প

২। বাঙালির বিয়ে — দ্বিভাসিক, শি

(বেঙ্গলি ওয়েডিং) — (ইংরেজি অনুবাদ, দীপশিখা ঘোষ)

৩। গেলেম নতুন দেশে — ভ্রমণ, সই

৪। একের মধ্যে অনেক — গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-রম্যরচনা-অমনিবাস, দে'জ পাবলিশিং

## সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের যে সমস্ত কাহিনি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে

১। 'দহন' — 'দহন', ঋতুপর্ণ ঘোষ, (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮)।

২। 'হেমন্তের পাখি' — 'হেমন্তের পাখি', ঊর্মি চক্রবর্তী, (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭)।

৩। 'গভীর অসুখ' — 'ক্যানসার', পিনাকী চৌধুরী, (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮)।

৪। 'রঙিন পৃথিবী' — 'টলি লাইটস্', ২০০৮, অর্জুন চক্রবর্তী, (আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬)।

৫। 'ইচ্ছের গাছ' (গল্প) — 'ইচ্ছে' ২০১১, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা রায়।

৬। 'অলীক সুখ' (আনন্দ, ২০০২) — 'অলীক সুখ', ২০১৩, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা রায়।

৭। 'রামধনু রঙ' (গল্প) — 'রামধনু', ২০১৪, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা রায়।

৮। 'ভালোমেয়ে খারাপ মেয়ে' (গল্প) — 'ভালোমেয়ে খারাপ মেয়ে', তমাল দাশগুপ্ত।

৯। 'উড়ো মেঘ' — আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২, 'উড়ো মেঘ', অতনু ঘোষ।

১০। 'পালাবার পথ নেই' — আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, 'পালাবার পথ নেই', রাজা ঘোষ।

১১। 'কাচের দেওয়াল' — আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩, 'কাচের দেওয়াল', অনিন্দ্য সরকার।

১২। 'চার দেওয়াল' — 'ফ্যামিলি অ্যালবাম', মৈনাক ভৌমিক।

## সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস

| | | |
|---|---|---|
| ১। যখন যুদ্ধ | — | প্রকাশক : সংবাদ, ১৯৮৬। |
| ২। আমি রাই কিশোরী | — | প্রকাশক : সংবাদ, ১৯৮৯। |
| ৩। কাচের দেওয়াল | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। |
| ৪। ভাঙ্গনকাল | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬। |
| ৫। হেমন্তের পাখি | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭। |
| ৬। দহন | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮। |
| ৭। গভীর অসুখ | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮। |
| ৮। কাছের মানুষ | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮। |
| ৯। পরবাস | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯। |
| ১০। অন্য বসন্ত | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০। |
| ১১। পালাবার পথ নেই | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০। |
| ১২। নীল ঘূর্ণি | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১। |
| ১৩। উড়ো মেঘ, অলীক সুখ | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২। |
| ১৪। আলোছায়া | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩। |
| ১৫। জলছবি | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৪। |
| ১৬। ছেঁড়া তার | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫। |
| ১৭। রঙিন পৃথিবী | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬। |
| ১৮। আয়না মহল | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬। |
| ১৯। চার দেওয়াল | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮। |
| ২০। রূপকথা | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯। |
| ২১। রঙ বদলায় | — | প্রকাশক : সাহিত্যম, ২০০৯। |
| ২২। আঁধারবেলা | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০। |
| ২৩। গহিন হৃদয় | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০। |
| ২৪। অর্ধেক আকাশ | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২। |
| ২৫। একা | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩। |
| ২৬। বিষাদ পেরিয়ে | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪। |
| ২৭। দমকা হাওয়া | — | প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫। |

২৮। অদ্ভুত আঁধার এক — প্রকাশক : মডার্ণ কলাম, ১৯৯৬।

২৯। হলুদ গাঁদার বনে — প্রকাশক : মডার্ণ কলাম, ১৯৯৭।

৩০। ধূসর বিষাদ — প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, ১৯৯৭।

৩১। ঢেউ আসে ঢেউ যায় — প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, ১৯৯৮।

৩২। দশটি উপন্যাস — প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১।

৩৩। চেনা মুখ অচেনা মুখ — প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, ২০০১।

৩৪। যুগলবন্দী — প্রকাশক : সৃষ্টি প্রকাশন, ২০০১।

৩৫। সহেলি — প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, ২০০১।

৩৬। অনিকেত — প্রকাশক : সুপ্রিম পাবলিশার্স, ২০০৩।

৩৭। তিন কন্যা — প্রকাশক : পুষ্প, ২০০৩।

৩৮। মেঘপাহাড় — প্রকাশক : পুষ্প, ২০০৪।

৩৯। একা জীবন — প্রকাশক : সাহিত্যম, ২০০৪।

৪০। শেষ বেলায় — প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪।

৪১। প্রেম অপ্রেম — প্রকাশক : সাহিত্যম, ২০০৫।

৪২। হঠাৎ একদিন — প্রকাশক : পুষ্প, ২০০৬।

৪৩। হলুদ গাঁদার বনে — প্রকাশক : দীপ প্রকাশন, ২০০৮।

৪৪। শূন্য থেকে শূন্য — প্রকাশক : সাহিত্যম, ২০০৮।

৪৫। তিন মিতিন — প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।

৪৬। সম্পর্ক — প্রকাশক : পুষ্প, ২০০৮।

৪৭। আবর্ত — প্রকাশক : পুষ্প, ২০০৯।

৪৮। নয়টি উপন্যাস — প্রকাশক : সাহিত্যম, ২০০৯।

৪৯। মন্থন — প্রকাশক : দীপ প্রকাশন, ২০০৯।

৫০। সময় অসময় — প্রকাশক : দীপ প্রকাশন, ২০১০।

৫১। সেরা দশটি উপন্যাস — প্রকাশক : সাহিত্যম, ২০১১।

৫২। মেঘের পর মেঘ — প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২।

৫৩। ঠিকানা নেই — প্রকাশক : সাহিত্যম, ২০১২।

৫৪। সেরা পাঁচটি উপন্যাস — প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪।

৫৫। ফিরে দেখা অদ্ভুত আঁধার এক — প্রকাশক : লাল মাটি, ২০১৪।

৫৬। এই আকাশের নিচে — প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫।

বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনের উত্থান-পতন, চেনা-অচেনা সম্পর্কের নানা রূপভেদ, ক্ষয়িষ্ণু মূলবোধের শিকার অস্থির দিশাহারা যুবসমাজ, চেনা সম্পর্কের অন্তরালে বাস করা বিশ্বাহীনতার ঘুন পোকা যা দাম্পত্য জীবনের স্তরকে আলগা করে দিয়েছে, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, প্রভৃতি পারিবারিক চেনা বৃত্তগুলির মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, অশ্রদ্ধেয় অবমাননাকর মনোভাব — তাদের মধ্যে সৃষ্ট করছে যোজন ব্যাপী দূরত্ব — একদিকে এই ভাঙ্গনের প্রতিচ্ছবি আবার সমান্তরালে শূন্য থেকে পূর্ণতার পথে জীবন যুদ্ধে উত্তরণের কাহিনী, নারী জীবনের জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করবার অদম্য প্রচেষ্টাকে কুর্ণিশ জানিয়ে লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর সাহিত্য সৃজন করেছিলেন। বিশ ও একুশ শতকের সমাজ ভাবনা, যুগধর্ম জাত নর-নারীর জটিল স্তর-এর বিভিন্ন পর্যায়গুলোর এক পূর্ণায়ত রূপ আমরা পরিলক্ষণ করি তাঁর উপন্যাসগুলিতে। এখানেই তাঁর লেখনীর স্বতন্ত্র্যতা আর সফলতা। নারী জীবনের বিভিন্ন স্তরগুলোকে হাতের তালুর মতো করে চেনার স্পর্ধা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মধ্যে বিদ্যমান। ব্যক্তিত্বময়ী নারী ঔপন্যাসিক শুধু নয়, একজন দায়িত্বশীলা নাগরিক, একজন সুন্দর ব্যক্তি মানসিকতার অধিকারীনী নারী হিসেবে তিনি চিরকাল সকলের হৃদয়ে সস্নেহে জাজ্বল্যমান রইবেন।

**উৎস সূত্র :**


১। শেষ সাক্ষাৎকার, 'ভালোবাসার গল্প', সুচিত্রা ভট্টাচার্য, Windows [youtube] ।

২। মণিকুন্তলা কেশন, 'শুভেচ্ছাবার্তা', মণ্ডল সৃজনী (সম্পাদক) 'দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা', 'ক্রোড়পত্র সুচিত্র ভট্টাচার্য', এপ্রিল-মে, ২০১৯।

৩। 'স্মরণজিৎ ও সুচিত্রা ভট্টাচার্য' প্রবন্ধ, বর্ণময়, ভট্টাচার্য সুচিত্রা, লালমাটি প্রকাশন, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১০ জানুয়ারি, ২০১৬, লেখিকার শুভ জন্মদিনে, পৃ: ৩২৩।

৪। 'দিক-শূন্য-পুর', 'বর্ণময়', ভট্টাচার্য সুচিত্রা, লালমাটি প্রকাশন, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ-১১ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ: ৩২-৩৩।

৫। ''ছেলে-মেয়েতে বিভেদ মেয়েরাই তৈরি করে'', 'বর্ণময়', ভট্টাচার্য সুচিত্রা, লালমাটি প্রকাশন, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ-১০ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ: ১৬৮।

৬। 'অর্ধেক আকাশের মজলিশ', তদেব, ঐ, পৃ: ১৬৪।

৭। 'অকথিত', বন্দ্যোপাধ্যায় কুণাল, সম্পাদনা সৃজনী মণ্ডল, 'দক্ষিণের সাঁকো' পত্রিকা, ক্রোড়পত্র, সুচিত্রা ভট্টাচার্য), অনন্যা, বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৫০, প্রকাশ — এপ্রিল-মে, ২০১৯, পৃ: ৮০।

৮। ''দুরারোগ্য নিকেতন'', 'বর্ণময়', ভট্টাচার্য সুচিত্রা, লালমাটি প্রকাশন, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১০ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ: ৪৭।

৯। 'স্মরণজিৎ ও সুচিত্রা ভট্টাচার্য', তদেব, ঐ, পৃ: ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯।

১০। 'আমার কথা', তদেব, ঐ, পৃ: ১৬।

১১। স্মরণজিৎ ও সুচিত্রা ভট্টাচার্য', তদেব, ঐ পৃ: ৩২৫।

১২। 'স্মরণজিৎ ও সুচিত্রা ভট্টাচার্য', 'বর্ণময়' তদেব ঐ, পৃ: ৩৩০।

**গ্রন্থঋণ :**

১। 'কথা নদী সুচিত্রা' (সুচিত্রা স্মারক গ্রন্থ) : সম্পাদক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬।

২। 'বর্ণময়' : সুচিত্রা ভট্টাচার্য, লালমাটি প্রকাশন, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১০ জানুয়ারি ২০১৬।

৩। 'দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা' (ক্রোড়পত্র সুচিত্রা ভট্টাচার্য) : সম্পাদক সৃজনী মণ্ডল, অনন্যা, বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৫০, প্রকাশকাল এপ্রিল-মে ২০১৯।

**তথ্যঋণ :**

১। 'দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা' (ক্রোড়পত্র সুচিত্রা ভট্টাচার্য) : সম্পাদক সৃজনী মণ্ডল, অনন্যা, বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৫০, প্রকাশকাল এপ্রিল-মে ২০১৯।